মার্কিন, রুশ বাণিজ্যিক চাপে ভারতের পরনির্ভর পঙ্গু সরকার জাইতাপুর, কুড়ানকুলাম প্রভৃতি কেন্দ্র চালু করার চেষ্টা করলেও এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আর আয়লার সময় কলাপক্কম কেন্দ্র জলের তলায় চলে যাওয়ায় সামগ্রিক নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে।

আমাদের বায়ু (Windmill), ঢেউ, ভূস্তরের উষ্ণতা ও শক্তি, বায়োগ্যাস, বায়োমাস, ভ্যারেন্ডা প্রভৃতি অপ্রচলিত উৎসগুলোর উপর জোর দিতে হবে। জলবিদ্যুতের উপর জোর দিতে হবে। সবচেয়ে জোর দিতে হবে সৌর বিদ্যুতের (Solar Energy) উপর। আমাদের রয়েছে এক সূর্যস্নাত ঝকঝকে আবহাওয়ামণ্ডল। এই অশেষ সৌর সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে শক্তির চাহিদা মেটাতে হবে। জার্মানী প্রভৃতি দেশের থেকে শিখতে হবে। প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায় ও বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল লাগাতে হবে।এই বিদ্যুৎ হবে সুলভ এবং পরিবেশ বান্ধব। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শক্তি দপ্তরের অপ্রচলিত শক্তি ও বিদ্যুতায়নের উপর জোর দিতে হবে। বাজেটে বেশি বরাদ্দ করতে হবে। এবং সাম্প্রতিক আধুনিক ও কার্যকরী প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আই. আই. টি. আই. আই. এস. প্রভৃতি উৎকর্ষ প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোকে গবেষণায় ও কাজে যুক্ত করতে হবে।

একটা কথা চালু আছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয় তবে তা হবে জলের দখলদারি নিয়ে। সম্প্রতি দেখা গেল, লিবিয়ায় পেটোয়া স্বৈরশাসক গদ্দাফিকে আমেরিকা ন্যাটোর সাহায্যে সরিয়ে দিল ও হত্যা করল লিবিয়ার অন্তঃসলিলা বিপুল মিষ্টি জলের ভান্ডারের দখলদারির ক্ষেত্রে তাদের কথা না শোনার জন্য। চাক্ষুস বা সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখি জলের কি হাহাকার। গাঁয়ের বধুদের কলসী কাঁখে কত দূর দুরান্তে যেতে হয়। শহর ও শিল্পাঞ্চলে বস্তি ও শ্রমিক লাইনে একটা টাইম কল বা টিউবওয়েলের সামনে দীর্ঘ লাইন ও ঝগড়াঝাটি। কবেরীর জল ও পেরিয়ারের বাঁধ নিয়ে তামিলনাড়ুর সাথে কর্ণাটক ও কেরলের দ্বন্দ্ব। তিস্তার জলবন্টন ও টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের রাগ-অনুরাগ। যথাক্রমে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের জল সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত ও চিনের প্রতি পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষোভ। গঙ্গার জলপ্রবাহ কমে যাওয়ায় ও অনেকটা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে খাল কেটে ব্যবহার হয়ে যাওয়ায় পদ্মা ও ভাগীরথীর নাব্যতা উদ্বেগজনকভাবে কমে যাওয়া এবং কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর কোমাতে চলে যাওয়া। চেন্নাই প্রভৃতি শহরে দূরের গ্রামাঞ্চল থেকে জল এনে চড়া দামে সরবরাহ। আর দূষণ প্রভৃতি কারণে নানাভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারানো।

সব মিলিয়ে মিষ্টি জলের ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের (Potable safe drinking water) খুবই সঙ্কট। অথচ আমাদের দেশ অসংখ্য নদী, খাল, বিল, হ্রদ, জলাশয়ে পরিপূর্ণ, ছ'রকম ঋতু এবং বর্ষার মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে প্রবল বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদধন্য। বৃহৎ পুঁজির মুনাফার স্বার্থে বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প এবং উন্নত মানের ভূস্তরের জল দিয়ে 'বটলড মিনারেল ওয়াটার' ও 'কোলা কোল্ড ড্রিঙ্কস' তৈরি করে সমাজ জীবনে সাধারণ পানীয় জলের পরিবর্তে এগুলো গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার বিপরীতে একশ দিনের কাজ' সহ প্রকল্পগুলি কাজে লাগিয়ে আমাদের নদী, খাল, জলাশয়গুলি সংস্কার করে বর্ষার মিষ্টি জল ধরে রাখতে হবে সারা বছর। (Rain water harvesting) এর ফলে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলের অপচয় বন্ধ করা যাবে, অন্যদিকে সারা বছর পানীয়, গৃহস্থালীর ও অন্যান্য প্রয়োজনের জল পাওয়া যাবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় Land scaping, চেক বাঁধ নির্মাণ, sprinkling system গড়ে তোলার মাধ্যমে আধুনিক কৃষির ও সবুজায়নের কাজে এই জলকে ব্যবহার করা যাবে। ফলে যথেচ্ছ ভূগর্ভস্থ জল তোলা বন্ধ হবে। ভূস্তর ও প্রকৃতির ভারসাম্য অটুট থাকবে। অহেতুক বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ হবে না। কৃষকের সাথে কৃষকের দ্বন্দ্ব বন্ধ হবে। সমাজ আর্সেনিকোসিস, ফ্লুরিসিস মুক্ত হবে। সরকার থেকে সাধারণ মানুষ সকলকে সৌর বিদ্যুৎ (Solar Energy) সৃষ্টি ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের (Rain water conservation and harvesting) কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

ফ্লোরিন, ফ্লোরাইড, ফ্লুরোসিস ও দক্ষিণ দিনাজপুর

গৌতম মৃধা

ফ্লোরিন ও ফ্লোরাইড ঃ প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে ফ্লোরিন পদার্থটি পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেকটাই ফ্লোরাইড যৌগ হিসাবে অবস্থান করে। সাধারণভাবে মানবদেহে দাঁত ও হাড়ের গঠনে অল্পমাত্রায় ফ্লোরাইড প্রয়োজন হয় (০.৫-০.৮ মি. গ্রা. / লিটার)। নাহলে দাঁতের ক্ষয়রোগ হয় (Dental Caries)। মানবদেহে যেটুকু ফ্লোরাইড থাকে তার ৯৬% থাকে দাঁত ও হাড়ে।

ফ্লুরোসিস ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্স (BIS) নির্ধারিত সহনমাত্রা (Permissible limit) হল ১.৫ মি. গ্রা. / লিটার অথবা ১.৫ পি. পি. এম / লিটার। এর বেশি মাত্রায় ফ্লোরাইড যুক্ত জল কেউ যদি দীর্ঘদিন খান তার ফ্লুরোসিস রোগ হতে পারে।

বলে রাখা প্রয়োজন যে পানীয় বা রান্নার জন্য ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ জলে (Ground Water) সবচেয়ে বেশি ফ্লোরাইড থাকে। এছাড়া ফ্লোরাইড দূষিত ভূগর্ভস্থ জলে চাষ হওয়া চাল, শাকসবজি, ফলমূলের মাধ্যমেও ফ্লোরাইড শরীরে প্রবেশ করে। কোন কোন ওষুধ, প্রসাধন

দ্রব্যে ফ্লোরাইড বেশি মাত্রায় থাকে। কোনভাবে আহার বা পানীয়ের সাথে ফ্লোরাইড দেহে বেশি মাত্রায় প্রবেশ করলে ফ্লুরোসিস রোগ হয়। ফ্লুরোসিসের লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি শিল্পে অনেক সময় দুর্ঘটনায় ফ্লোরিন গ্যাস লিক করে তাৎক্ষণিক ফ্লুরোসিস (Acute Fluorosis) রোগ হতে পারে।

ফ্লুরোসিসের ধরন ও লক্ষণ:

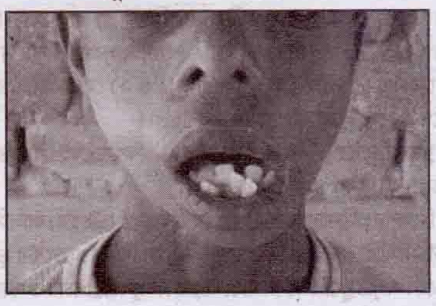

১) Dental Fluorosis : মূলত ছয় থেকে ১১ বছরের বাচ্চাদের দেখা যায়। খড়ির মতো দাঁতের গড়ন হয়ে যায়, তার পর কালচে হলুদ বা খয়েরি ছোপ বা পাশাপাশি দাগ দেখা যায় এবং অবশেষে দাঁত ভঙ্গুর হয়ে ক্ষয়ে যায়।

২) Skeletal Flurosis : ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, কোমর, পা প্রভৃতি জায়গায় ব্যথা ও শক্ত হয়ে যাওয়া। অস্থি সন্ধিগুলিতেও অনুরূপ ব্যথা,শক্ত হয়ে যাওয়া। উরু ও পায়ের হাড় ভেতর বা বাইরের দিকে বেঁকে যাওয়া। হাঁটু, কোমর ইত্যাদি জায়গায় নড়াচড়ার সমস্যা তৈরি হয়। বেঁকিয়ে দাঁড়াতে হয়, খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। চিবুক বুকে ঠেকানো যায় না, হাঁটু না ভেঙে নীচু হওয়া যায় না, হাঁটু মোড়া যায় না ইত্যাদি।

৩) Non-Skeletal Fluorosis : Dentalও Skeletal Fluorosis-র চিকিৎসা না করালে এবং বেশি ফ্লোরাইডযুক্ত জল ও খাবার খাওয়া চালিয়ে গেলে Non-Skeletal বা Systemic Fluorosis হয় যা প্রতিটি শারীরিক তন্ত্রে প্রভাব ফেলে। হতে পারে কোষ্ঠ কাঠিন্য, ডায়ারিয়া, পেট ব্যথা, মলে রক্ত, স্নায়ু দৌর্বল্য ও অবসাদ, দাঁত ও আঙুলে শিরশিরে ব্যথা, বার বার জল তেষ্টা পাওয়া, বহুমূত্র, মাংসপেশীর শক্তি হ্রাস এগুলি হল Non-Skeletal Fluorosis -এর প্রধান লক্ষণ।

ফ্লুরোসিসের প্রাদুর্ভাব: এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার ৩০টি দেশে ফ্লুরোসিসের প্রাদুর্ভাব আছে। তার মধ্যে চিন, ভারত, মিশর, লিবিয়া, আলজিরিয়া, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রকোপ বেশি।

ভারতে ১৯৩০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম ফ্লুরোসিস রোগী ধরা পড়ে। জল পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের ৩৫০টি জেলা ফ্লুরোসিস ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৯টি রাজ্যের ১৯৬টি জেলায় জাতীয় ফ্লুরোসিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NPPCF)' রূপায়ণ শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন পর্বে। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি প্রাদুর্ভাবপূর্ণ জেলা হল: বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে NPPCF সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ফ্লুরোসিস চিত্র: জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ২০১০ সালে যে তথ্য প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাঁচটি ব্লক ফ্লুরোসিস প্রাদুর্ভাবপূর্ণ। বিগত দু'বছর ধরে চাষ ও পানীয় জলের জন্য বল্গাহীনভাবে ভূগর্ভস্থ জল তোলায় ফ্লোরাইড দূষণ আরও কতটা ছড়িয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনও উঠে আসেনি। নিম্নলিখিত গ্রামের নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত ফ্লোরাইড পাওয়া গেছে—

১) **বংশীহারী ব্লক:** দাসুল, সর্দারপুর, ধুতুরা, ইলাহাবাদ, জাহারপুর, জামার, কারাই, বাগদুয়ার, বাজে হরিপুর, বিলবারাইল, দৌলতপুর, দেওগাঁ, দেউরিয়া, মিরাহাটি, আঁধারমানিক, চকশদুল্লা, মাশিপুর, ইলামপুর, জোৎনাশি, মিরপুর, মরাই, শ্যামপুর, আলিগড়া, আমাই, বরাহরা, বরাহরিপুর, বারইল, বুনিয়াদপুর, ধিলতাইল, ধুমপাড়া, গৌরীপাড়া, হলদি, কাইল, কানুর, মিরজাদপুর, রশিদপু, সাহানন্দা, শায়েস্তাবাদ, শিবপুর ও থিঙ্গুর (৪১টি গ্রাম)।

২) **গঙ্গারামপুর ব্লক:** ভোলানাথপুর, ফরিদপুর, দোমাথা, গোকুলপুর, কামারখাইর, নেহামবা, পূর্ব বিষ্ণুপুর, রায়পুর, রায়শালী, আবিদপুর, বাসুরিয়া, ভদ্রা, চকশিবপুর, দৌয়াতপুর, হামজাপুর, লালচন্দ্রপুর, লটকেশবপুর, মাধবপুর, তেলিয়াপাড়া, বেলবাড়ি, জয়পুর, বোয়ালদহ, জালালপুর, মহারাজপুর, মহিপুর, ঠেঙ্গাপাড়া, চালুন, সাহারা, শঙ্করপুর, সিদিলিম, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর, গোপালপুর,

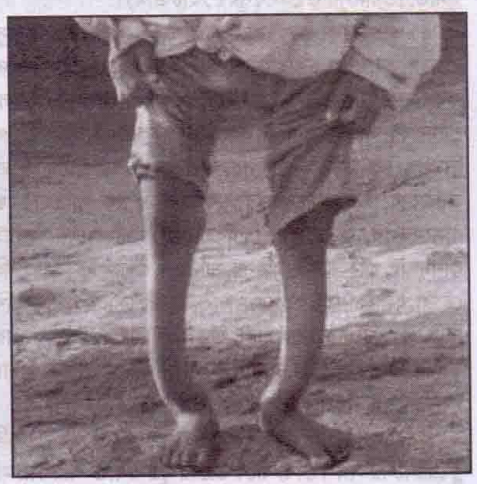

কামারপুকুরিয়া, এনায়েৎপুর, হরিদাসপুর, জাহাঙ্গিরপুর, কসবা, মহুরকিসমত, বাজেতপুর, বিকাইর, ফতেনগর, হাঁপানিয়া, হীরণ্যবাটি, যাদববাটি, কারিয়াল, মহাশুরা, নাগান, নন্দনপুর, রাধানগর, রানীপুর, শাহবাজপুর, সাহানালি, শায়রাপুর, শেখপুর, সিনরেইল, তিলনা, অনন্তপুর, ভোরাল, দেবীপুর, জয়দেবপুর, কাঁটাবান, কাঁটাতাইর, কাঁঠালিহাট, হোসেনপুর, মল্লিকপুর, নওদাপাড়া ও শিংফারকা (৬৫টি গ্রাম)।

৩) **কুমারগঞ্জ**: বেহাতাইর, ভোওড়, চূড়াল, কৃষ্ণপুর, গৌরাঙ্গপুর, হরিশপুর, কারা, কুড়াহা, মাঝিয়ান, মালগাঁও, নারায়ণপুর, পাকপারা, পুন্ডের, সঙ্গদপুর, সীতাহার, উদয়পুর, ছাতমা, ধর্মপুর, দিওড়, যারলাই, খরাইল, খরাইল চাঁদপুর, পারিয়াল, পোড়াঝাড়, শ্যামনগর, তিরালি, বালতা, ভোলানাথপুর, চকমোহন, ঝড়খান্দা, দারাজপুর, দত্তমতী, দোরাহা দুর্গাপুর, এনাতুল্লাপুর, জাকিরপুর, কাকোতি, কালনা, মদনপুর, রাইখান, শাহবাজপুর, তুলাত, উছাত, অমৃতপুর, বরম, বেলতারা, বিষ্ণুপুর, চকবারহাম, দামোদরপুর, ঘোলদারা, গোবিন্দপুর, গ্রামতলা, জামিরবাড়ি, ঝিকাকুরি, কাঁটাকল, খারমার, বোদরা, মাতিজপুর, মোহনা, মোমিনপুর, মুগলিশপুর, পিরোজপুর, রাধানগর, সুন্দরতলা, উদাইল, আগাচ্ছা, বাফরা, বালুপাড়া, বয়রাপাড়া, বিশ্বনাথপুর, ব্রহ্মপুর, চকগোপাল, চকমামুদি, চকরামরায়, চাঁদপুর, ধাধলপাড়া, খানপুর, খাদামোহনা, মধ্যরামকৃষ্ণপুর, মামুদপুর, মহীপুর, পাড়শাহজাদপুর, পূর্ব গোবিন্দপুর, স্থলন্দপুর, তাজপুর, উছহানা, উত্তর কেশবপুর, ওয়ালিতারা, হরিশচন্দ্রপুর, কুমারগঞ্জ, সাফানগর, শাহজাদপুর, দাউদপুর, কৃষ্ণপুর, নবগ্রাম ও রায়ানারা (৯৪টি গ্রাম)।

৪) **কুশমণ্ডি ব্লক**: বটেশ্বর, জোতসুদাম, কৃষ্ণপুর, কুনিয়া, মীনাপাড়া, সরলা, দেউলবাড়ি, কালিকামোড়া, নারায়ণপুর, নূরপুর, পুনাত, ভিখানপুর ও কেশবপুর (১২টি গ্রাম)।

৫) **তপন ব্লক**: আখানগর, অন্তশিমুল, আজমতপুর, বাসুরিয়া, বাজরাপুকুর, বুধাচ, চকহোসেন, ঢাকালাইন, দাউদপুর দেগাঁও, দাওরা, করণজারা, মানাহালি, পাবাইল, পালিমহাদেবপুর, সরলবাটি, শ্যামনগর, আটিলা, বুনাইল, জাওরাপাড়া, কাইকুরি, নিমগাছি, পশ্চিম নিমপুর, চক মনিরাম, দুর্গাপুর, দ্বীপকান্দা, জিরদা, খোরদামালসা, জাজিয়ার, বাদ বাসুদেবপুর, চকবলরাম, চক সাতিহার, ছায়নি বাসুদেবপুর, ফতুল্লাপুর, গোবিন্দনগর, গোফানগর, হাসাইপুর, কাশমূলাই, খারিকাডালি, মুনিপুর, সাতিহার, শুলাপানিপুর, চক বলিরাম, ছেচরা, ধুলাহার, হজরতপুর, খাদাও, জগদীশবাটি, কমলপুর, খিরতা, নিহিনগর, সালাস, সালসামা, উত্তর গৌরীপুর, উত্তর খামরাইল, করদহ, কসবা বাতাইর, লক্ষ্মীপুর, মাগুরপুর, মান্দাপারা, মোল্লাজি, মুক্তারামপুর, নওগাঁও নিমতাইর (৬২টি গ্রাম)।

ফ্লুরোসিস নির্ণয়: যে সমস্ত ব্যক্তির দেহে ডেন্টাল বা স্কেলিটাল ফ্লুরোসিসের লক্ষণ দেখা যাবে তাদের মূত্র ও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফ্লুরোসিস নির্ণয় করা যাবে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের জনস্বাস্থ্য বিভাগ ফ্লুরোসিস ল্যাবরেটরি বানিয়েছে ও দামী আয়নোমিটার যন্ত্র বসিয়েছে। আয়নোমিটার যন্ত্রে মূত্রে ১ মি. গ্রা. / লিটারের বেশি ফ্লোরাইড পাওয়া গেলে তাকে ফ্লুরোসিস আক্রান্ত বলা যাবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চারটি স্থানে জলে ফ্লোরাইড পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে দুটি সরকারি— ১) বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল, ২) জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, বালুরঘাট। দুটি সরকার অনুমোদিত ১) বিজ্ঞান মঞ্চ, গঙ্গারামপুর ও ২) মোল্লার দীঘি রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, বংশীহারী।

ফ্লুরোসিসের চিকিৎসা: নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপর জোর দিতে হবে।

চিলেশন প্রক্রিয়ায় অনেক জায়গায় চিকিৎসার চেষ্টা হয়। ক্যালসিয়াম, ভিটামিনস বিশেষ করে 'বি', 'সি', 'ডি', অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভূমিকা রয়েছে। অপুষ্টি ফ্লুরোসিসের মাত্রা বাড়ায়। কিছু অস্ত্রোপচার ও সহযোগী সরঞ্জামের ভূমিকা আছে স্কেলিটাল ফ্লুরোসিসের ক্ষেত্রে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দন্ত চিকিৎসা ও ফিজিও থেরাপির।

ফ্লুরোসিস প্রতিরোধ (Prevention):

১) ফ্লোরাইড দূষিত ভূগর্ভস্থ জল বর্জন।

২) বৃষ্টি এবং নদী-খালের জল (rain and surface water) পরিশুদ্ধ করে পানীয় ও রান্না জল হিসাবে ব্যবহার।

৩) ফ্লোরাইড দূষিত ভূগর্ভস্থ জলে চাষ হওয়া শস্য, শাকসবজি, ফলমূল বর্জন।

৪) কালো চা, বিট নুন, হজমোলা, চূরণ, চাট মশলা, বিভিন্ন স্বাদবৃদ্ধিকারী মশলা, তামাক, সুপারি, কৌটোর খাবার, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রসাধন পরিহার করা।

৫) দুধ, দই, ছানা, লেবু, রসালো ফল, সবুজ লাল ও হলুদ তাজা শাকসবজি প্রভৃতি বেশি করে খাওয়া।

৬) পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

৭) ফ্লোরিনেটেড টুথ পেস্ট ও মাজন নিষিদ্ধ করা।

৮) নিয়মিত, অন্তত বছরে দু'বার, পানীয় ও রান্নার জল পরীক্ষা করা।

৯) নিয়মিত, অন্তত বছরে একবার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

১০) শারীরিক সমস্যা হলে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা।

১১) ৬-১১ বছরের বাচ্চাদের নিয়মিত দাঁত পরীক্ষা করানো।

ফ্লুরোসিসের প্রতিকার (mitigation : : ১) দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা::

ক) আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন নদী সংস্কার করে সেখানকার জল শুদ্ধ করে পাইপ লাইনে সরবরাহ।

খ) Rain water harvesting চালু করা প্রতি গৃহে ও গ্রামে।

গ) Rain water ও surface water এ কৃষিকাজ করা।

ঘ) জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে চিলেশান চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ অর্থোপেডিক ইউনিট তৈরি করা।

ঙ) পানীয় জল, খাদ্যাভাস ও কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য জেলা জুড়ে প্রচার।

২) **মধ্যবর্তী ব্যবস্থা**: ক) ফ্লোরাইড দূষিত নলকূপগুলি বন্ধ করে বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

খ) সম্ভব না হলে, জেলা বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তাবিত ডি-ফ্লোরিডেশন প্যাচ (চারকোল, অ্যাকটিভ অ্যালুমিনা প্রভৃতি) লাগানো নলকূপগুলিতে।

গ) জেলা জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে ফ্লুরোসিস রোগীদের চিহ্নিত ও রোগ নির্ণয় করা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অবধি প্যালিয়েটিভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ঙ) ব্লক হাসপাতাল অবধি ফিজিও থেরাপির ব্যবস্থা করা।

চ) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্কুল অবধি ফ্লুরোসিস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩) **আশু ব্যবস্থা:**

ক) পানীয় ও রান্নার জল পরীক্ষা করানো।

খ) ফ্লোরাইড বেশি থাকলে ফিল্টার করে গ্রহণ করা। চুন ও ফটকিরি মেশানো যেতে পারে।

গ) শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা হাসপাতালে যোগাযোগ করা।

সুন্দরবনের বন্য প্রাণী বাঘ ও ভারতের অন্তর্গত ব্যাঘ্র প্রকল্প

কুমুদরঞ্জন নস্কর

সুন্দরবনে বাঘের যে প্রজাতিটি পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক নাম প্যান্থারা টাইগ্রিস টাইগ্রিস (Panthera tigris tigris Linn), এদের বর্গ (Order)- Carnivora এবং শ্রেণি- স্তন্যপায়ী (Class-Mammalia)।

বাঘের আদি বাসস্থান বা উৎপত্তিস্থল সাইবেরিয়ার তুষার আবৃত স্থানে হলেও ভারতের বিভিন্ন গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে বাঘকে দেখা যায়। হিমালয়ের পাহাড়ে ঘেরা ঘন জঙ্গল এবং সুন্দরবনের গঙ্গানদীর মোহনায় ম্যানগ্রোভ আবৃত বিশাল ব-দ্বীপ অঞ্চলে ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবস্থায় বাঘ বসবাস করে এবং সুন্দরবনের জলা অঞ্চলে নিজেদের অভিযোজন করে নিয়েছে।

পৃথিবীর মোট ব্যঘ্রকুলকে তাদের বাসস্থানের উপর নির্ভর করে এবং আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা গাঠনিক পার্থক্য বিচার করে ৮টি উপ-প্রজাতিতে ভাগ করা হয়, যথা—

১) ক্যাসপিয়ান অঞ্চলের বাঘ (Panthera tigris virgata)— এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে;

২) বালি অঞ্চলের বাঘ (Panthera tigris balika)— এরাও বিলুপ্ত;

৩) সাইবেরিয়া অঞ্চলের বাঘ (Panthera tigris attaika), এরা আকারে বাকি ৭টি উপ-প্রজাতি অপেক্ষা বৃহৎ এবং এরা শীতল স্থানের বাসিন্দা;

৪) চিন দেশীয় বাঘ (Panthera tigris ameansis);

৫) ইন্দোচিন দেশীয় বাঘ (Panthera tigris kerbeti);

৬) ভারতীয় বাঘ (Panthera tigris tigris);

৭) সুমাত্রার বাঘ (Panthera tigris sumatri) ও

৮) জাভার বাঘ (Panthera tigris sansandaika)।

এই সুমাত্রা ও জাভা দেশীয় বাঘেরা আকারে সর্বাপেক্ষা ছোট। বাঘ এশিয়া মহাদেশেরই প্রাণী, এশিয়া ব্যতীত অন্য মহাদেশে বাঘের প্রজাতিদের (Panthera tigris L.) প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না।

বাঘ তার সাহসিকতা, বুদ্ধি ও শক্তির বলে মানুষের মনে ভয়ের ও তার সাথে শ্রদ্ধার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এরা অরণ্য বাস্তুরীতির সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের খাদক শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম।

বাঘ শিকার বহু আগে থেকেই রাজা-মহারাজা বা শিকারীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এর দ্বারা সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্য জাহির হত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো সভ্যতার বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে বাঘের মূর্তি অঙ্কিত দেখা গেছে। সেই প্রাচীন কালে অরণ্যে বা বন জঙ্গলে ঘেরা লোকালয় বা বন সংলগ্ন স্থানে প্রথম সভ্য মানুষ বসবাস করার সময় বাঘ দ্বারা তাদের গৃহপালিত গবাদি পশু আক্রান্ত হত,